যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

‘ফল’ বললেই মনের ভেতর অনেকগুলো ফল একসাথে নড়েচড়ে ওঠে। ভাগ্যফল, কর্মফল, যোগফল, বিয়োগফল আরও কত কী! তবে এ-ফল সে ফল নয়, এ হল জিএসটির আওতায় না আসা হাইজিনিক খাদ্য। রাস্তার ধারে দশ টাকা প্লেট দিয়ে শুরু। কী নেই আপেল, তরমুজ, কলা সবই আছে। মাছির ভনভনানি যদি ছেড়েও দেওয়া হয় রাস্তার ধারের ধুলোবালিমিশ্রিত কাটা ফল কতটা হাইজিনিক? তবুও বহাল তবিয়তে ভিড় জমছে রোডসাইডে। খদ্দেরও বিয়োগফলের কথা ভুলে, চালিয়ে যায় যোগফল...

ফোটো: **সুজয় চট্টোপাধ্যায়** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)

উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়ায় স্কুলজীবন শেষ করার পর কলেজে পড়তে কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর থেকে কলকাতাতেই আছি। তাই কলকাতার সঙ্গে একটা শিকড়ের টান তৈরি হয়ে গেছে। সাহিত্য যেহেতু আমার জীবনের সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, তাই একটা জিনিস খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, কলকাতার মতো এত সাহিত্যপাগল শহর খুব কম আছে। এত ম্যাগাজিন, এত সংবাদপত্র— মোদ্দাকথা সাহিত্যের এই বাতাবরণ খুব কম জায়গাতেই আছে। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগাযোগটাই আলাদা। সাহিত্য সংস্কৃতির যে বলয় এখানে আছে তার ব্যাপ্তি বিশাল। কলকাতায় যে কলেজ স্ট্রিট আছে এমন জায়গা সারা ভারতে কেন পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না। একবার কলেজ স্ট্রিটে যেতে পারলে এত বইয়ের মধ্যে থাকতে পারলে তখন যেন মনে হয় পৃথিবীটা স্বর্গ। রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে গেলে জীবনটা অনেক বেশি স্নিগ্ধ মনে হয়। আর পুরনো কলকাতা আমার খুব পছন্দের জায়গা। চিতপুর, আহিরিটোলা, শোভাবাজার— এই এলাকাগুলিতে একটা সময় হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াতাম, চলে যেতাম গঙ্গার ঘাটে। উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে এখনও ইতিহাসের গন্ধ পাওয়া যায়।

কলকাতার রাস্তায় এখন এত গাড়ি হয়ে গেছে, যার ফলে আনম্যানেজেবল সিচ্যুয়েশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া থেকে শিয়ালদহ অবধি যে মহাত্মা গান্ধী রোড এর চেয়ে খারাপ রাস্তা বোধহয় কলকাতায় আর নেই। ওখানে যদি কেউ একবার ঢুকে পড়ে তার এক-দেড় ঘণ্টা সময় অনায়াসে বসে বসে কাটাতে হবে, সে বাসেই হোক বা গাড়িতে। ওখানে যে ট্রাম কেন এখনও চালায়, এ বিষয়ে কেউ কেন ভাবছে না জানি না! ট্রামের জন্য তো অসুবিধা আরও বেশি হয়। বেহালার মতো জায়গায় ট্রাম তুলতে পারল আর ওখানে যে কেন পারছে না জানি না!

ষাটের দশকে যখন আমি প্রথম কলকাতা আসি তখন নতুন করে গড়ে উঠছে কলকাতা। তখন রাজনীতি এত প্রবল ছিল না। *এরপর সাতের পাতায়*

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

এগিয়ে যাওয়া সভ্যতা

সৌরভ মণ্ডল

সোমবারের সকাল মানেই একটা বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার। যেন বহুদিন হল যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া হয়নি। জিনিসপত্র গোছগাছের একটা ব্যাপার তো আছে নাকি! আসলে আমরা, মানে আমাদের বন্ধুস্থানীয় কলিগরা কর্মক্ষেত্রকে ভালোবেসে যুদ্ধক্ষেত্রও বলি। আর যুদ্ধের কথা কেনই বা বলব না, যদি কেউ বিশ্বযুদ্ধ বা নিদেনপক্ষে কার্গিল যুদ্ধও না দেখে থাকে, তাকে একবার উঠতে বলব অফিস টাইমে বেলঘরিয়া থেকে কোনও ডাউন ট্রেনে। দুটো পা রাখার জায়গার জন্য সে যে কী যুদ্ধ, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যদিও-বা বেলঘরিয়া থেকে দমদম একটা স্টেশন। তবে ওই মিনিট পাঁচেক যাবার জন্য নতুন যাত্রীকে যে ক’টা ট্রেন ছাড়তে হবে তার ইয়ত্তা নেই। তবে ওই যে, পাঁচ বছর যুদ্ধের ময়দানে নামতে নামতে এখন ব্যাপারটা আমাদের, মানে যারা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করি তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

যা হোক ট্রেন থেকে তো নামা হল। তারপর আবার দৌড়। সাবওয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যদি একটু ঠান্ডা মাথায় দেখে তার মনে হবে যেন এরা সব ম্যারাথনে যাবে। আসলে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের লাইফটাই তো এমন। এই র‍্যাট-রেসে থমকে গিয়ে শ্বাস নেবার সময় কোথায়! এরপর ছুটতে ছুটতে গিয়ে মেট্রোর লাইনে দাঁড়ানো। এ রুটিন রোজকার। তবে এই ব্যস্ততা-ছুটে চলার মাঝখানে এমন কিছু কিছু ঘটনাও চোখে পড়ে যেগুলো নিয়ে আমাদের মতো আদ্যোপান্ত কর্পোরেট লোকও ভাবতে বাধ্য হয়।

মেট্রো ধরে রোজ আমাকে এসপ্ল্যানেড নামতে হয়। সেদিনও যথারীতি মেট্রোতে উঠেছি। এত ভিড়, মনে হচ্ছে একটা বেলুনে যতটা জায়গা তার থেকে বেশি গ্যাস ভরা হয়েছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই ব্যস! আমার পায়ের ওপর দুজনের পা। কোনক্রমে একপাশে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালাম। যেদিকে দাঁড়িয়েছি সেটা আবার লেডিস সাইড।

এদিকে ওদিকে খুব বেশি নড়াচড়াও করতে পারছি না। হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তেই মনের ভেতর একটা খারাপলাগা তৈরি হল। এক সুন্দরী মহিলার পাশের সিটটাতে যে বসে আছে সে একটি ট্রান্সজেন্ডার মানে যাকে গোদা বাংলায় হিজড়ে বলি। মহিলার হাবভাব দেখে বুঝতে পারছি তিনি কমফোর্টেবল ফিল করছেন না। এবার হঠাৎ করেই মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘একটু সরে বসতে পারছেন না! যত্ত সব...!’ সে সরে বসলো। কম্পার্টমেন্ট ভর্তি লোক ট্রান্সজেন্ডারের দিকে তাকিয়ে। যেন সে কী একটা অপরাধ করে ফেলেছে! এরা যেন আমাদের সমাজে থেকেও সমাজবহির্ভূত জীব। সে নিজের মুখটা নামিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। আমার মনে হচ্ছিল সে নয়, আমাদের সিভিলাইজেশন, আমাদের এগিয়ে যাওয়া সভ্যতা মুখ নামিয়ে বসে আছে লজ্জায়...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বর্ণালি: দক্ষিণাপন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মসূত্রে কিংবা নিছক ঘোরার নেশাতেই কেউ কেউ ঘুরে বেড়ান উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে গুজরাত, রাজস্থান, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী— সারা দেশ। সেইসব রাজ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী কিছু কিছু তাঁদের চোখেও পড়ে, কিন্তু ইচ্ছে এবং প্রয়োজন থাকলেও সব সময় তা কেনা হয়ে ওঠে না। কলকাতায় তার একটা সুন্দর সমাধানক্ষেত্র আছে। সেখানে কাশ্মীরি শাল বা অন্য কোনও হাতের কাজ অথবা ত্রিপুরার বাঁশের তৈরি কোনও ফার্নিচার বা আনারসের জ্যাম— একই ছাদের তলায় কিনতে পাওয়া যায়। কলকাতায় এরকম একটি ঠিকানা দক্ষিণে গড়িয়াহাট রোডের উপর ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে দক্ষিণাপন শপিং কমপ্লেক্স, সংক্ষেপে দক্ষিণাপন।

এই শপিং সেন্টারটি নির্মাণ করেছিল কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (KIT)। দোতলা এই বাজারটির বিশেষত্ব এই যে অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি এটি একটি ওপেন এয়ার মার্কেট। এরকম মুক্ত বাজার চত্বর কলকাতায় আর নেই যেখানে আবার একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও আছে। সেটির নাম মধুসূদন মঞ্চ।

দক্ষিণাপন যেন এক মিনি ভারত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এমন রংবাহারি প্রদর্শনী খুব কমই দেখা যায়। সরকারি হ্যান্ডলুম, সুতি, খদ্দর কিংবা যে কোনও ফেব্রিক, বেতের, বাঁশের মোড়া ও অন্যান্য ফার্নিচার, বেডকভার, ট্রাইবাল বা ইমিটেশন জুয়েলারি, এথনিক ড্রেসেস, জুতো থেকে জ্যাম-জেলি— কী না পাওয়া যায়! ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের তৈরি নানান ডিজাইনের শাড়ি ও অন্যান্য হাতের কাজ ও শিল্পসামগ্রী সব এক ছাদেরে তলায়। রাজস্থানী শাড়ি অথবা অসমের কারুশিল্প, কাশ্মীরের কার্পেট কিংবা কেরালার গয়না, সব। তাছাড়াও রয়েছে বেসরকারি প্রচুর দোকানপাট, সেখানে নানান ফ্যান্সি পোশাক ও অন্যান্য দ্রব্যের সম্ভার। এমনকী বিশেষত মহিলাদের রেডিমেড পোশাক কেনার পর সঙ্গে সঙ্গে ফিটিংস ঠিক করিয়ে নেওয়ার জন্য টেলারিং স্ট্যান্ডও। ক্রেতারাও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের। তাঁদের প্রয়োজন এবং রুচিতেও রয়েছে বৈচিত্র। দামও গুণমান অনুযায়ী।

সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে 'বিশ্ব বাংলা' বিপণি। শান্তিপুরের তাঁতের শাড়ি কিংবা কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, টেরাকোটা হোক বা দার্জিলিং চা, সুন্দরবনের মধু কিংবা উত্তম-সুচিত্রার ছবির ডিভিডি, প্যাকেটজাত নলেন গুড় বা মিহি সুতোর পাঞ্জাবি— সব পাওয়া যায় এক ছাদের তলায়। ঝকঝকে রুচিসম্মত পরিবেশে।

দক্ষিণাপণের বাড়তি আকর্ষণ মধুসূদন মঞ্চ। এখানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে, আবার অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নিয়মিত নাটকের শো-ও হয়ে থাকে। ফলে কেনাকাটা এবং সাংস্কৃতিক বিনোদন একই সঙ্গে একই জায়গায় সেরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। রসনা তৃপ্ত করার জন্যও রয়েছে হরেক স্বাদের হরেক খাবারের দোকান।

আর এক দিকেও দক্ষিণাপণ অনন্য, তা হল এর বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ এবং সেখানে আড্ডার হাতছানি। এমনটি কলকাতায় প্রকৃত অর্থেই দুর্লভ। কোনও প্রয়োজন না থাকলেও শুধুমাত্র আড্ডা দেওয়ার জন্যও অনেকে ভিড় করেন এখানে। কেউ শুধু একান্তে বসে বই পড়ে সময় কাটিয়ে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে এসে ইন্ধন জুগিয়ে যায় চা বা কফিওয়ালা।

আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের জনপ্রিয়তায় কলকাতা বেতার

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-১০

'গোলপোস্টের দিকে দুই দলই এগোচ্ছেন। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়ের পায়ে বল। ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন অন্যপক্ষ। গোলরক্ষকও বেশ সতর্ক। কিন্তু না, সব সতর্কতাকে উপেক্ষা করে গো-ও-ও-ও-ল।' এইভাবেই কলকাতা বেতার শ্রোতাদের মনে তোলপাড় তুলত। শ্রোতাদের চোখের সামনে মাঠের প্রতিটা কোণা, প্রতিটা খেলোয়াড়ের অভিব্যক্তি সবকিছুই জ্বলজ্বল করত ঘোষকের ধারাভাষ্যে। শোনা যায়, মাঠের উত্তেজনা অনেক সময়ই ঘরময় ছড়িয়ে পড়ত। হাতাহাতি বেধে যেত, ট্রানজিস্টার ভাঙাভাঙি হতো। সে যাই হোক, সত্যি একটা সময় ছিল যখন রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণীর জনপ্রিয়তা ছিল শীর্ষে। শ্রোতারা শুধু শুনতেন না, চিঠিও লিখতেন। কেমন ছিল সেইসব দিন? কীভাবে, কবে থেকে শুরু হল রেডিওতে ধারাভাষ্য?

ফুটবল নিয়ে কথা বলতে বসলে অনেককেই সেই ১৯১১ সালে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক জয়ের স্মৃতিরোমন্থন করতে শুনেছি। কিন্তু এই কলকাতার বুকে ফুটবল খেলা জন্ম নিল কেমন করে সে কথা প্রবীণেরা জানলেও, অনেক নবীন হয়তো জানেন না। কলকাতার মাঠে প্রথম ফুটবল খেলা শুরু হয় ১৮৯২ সালে। তার আগে সাহেবরা খেলতেন রাগবি। সেটা ১৮৭৮-৭৯ সাল। একদিন ময়দানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক্যালকাটা (বর্তমান মোহনবাগান) মাঠ থেকে একটি বল রাস্তার উপর হঠাৎই এসে পড়ায়, গাড়ি থামিয়ে এক বালক বলে লাথি মেরে ফেরত পাঠিয়েছিল মাঠে। সাহেবরা চিৎকার করে মাঠ থেকে বলেছিলেন, 'কিক ইট বয়, কিক ইট'। বালকের নাম নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী।

তিনি বাঙালির মগজে ও মনে ফুটবলকে পরিচিত করার সর্বপ্রথম পুরুষ। তিনি পড়তেন হেয়ার স্কুলে। পরের দিন স্কুলে তাঁর বন্ধুদেরকে এই খেলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলে, স্কুলের মাঠেই এই খেলা নিয়মিত শুরু হয়েছিল। তবে যে-বল নিয়ে তাঁরা খেলতেন সেটি ছিল রাগবি বল। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসার স্ট্যাক এই দেখে নিজে একটি ফুটবল কিনে এনে বই থেকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ছেলেদের এই খেলা শিখিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার আগে থেকেই কলকাতার মাঠে বিভিন্ন ফুটবল ম্যাচ হতো এবং তার ধারাবিবরণী আকাশবাণীতে সম্প্রচারিতও হতো। বাঙালির মাতামাতির অন্যতম বিষয় যে ফুটবল এবং এই ফুটবলের সঙ্গে বেতারের সুসম্পর্ক তৈরি হলে যে বেতারেরই জনপ্রিয়তা বাড়বে— এ-কথা বুঝেছিলেন তৎকালীন স্টেশন ডিরেক্টর স্টেপলটন। তাই ১৯৩০ সালের মে মাস থেকে মাঠ থেকে সরাসরি ধারাভাষ্য শুরু হয় বেতারে। তবে সে ধারাবিবরণী ছিল ইংরেজিতে। ১৯৩৪ সালে প্রথম শুরু হয় বাংলায় ধারাভাষ্য। এই ভাবনার পিছনে ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। বাংলায় প্রথম ধারাভাষ্য দেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সঙ্গে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। প্রথম বাংলা ধারাবিবরণীর একটু নমুনা দিই বীরেনবাবুর স্মৃতিকথা থেকে। 'নমস্কার। এইবার আমরা কলকাতা ফুটবল খেলার মাঠ থেকে রিলে আরম্ভ করছি। আজ মোহনবাগানের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবের রিলে-থুড়ি, খেলা হবে। ও রাই, নামগুলো বল না। রাইচাঁদবাবু তন্ত্রধারকের মতো নাম বলতে শুরু করলেন, বীরেনবাবু পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন।...মশাই মাঠে খুব ভিড়, ওই বল চলেছে...হ্যান্ড বল। এ-কথায় রাইচাঁদবাবুসহ মাঠের সব সাহেব মেমরা হেসে উঠলেন। রাইবাবু বললেন, 'গোলকী হাতে ধরলে হ্যান্ডবল হয়রে গাধা?' আসলে বীরেনবাবু একেবারেই ফুটবল খেলা বুঝতেন না, তাই সঙ্গে নিয়েছিলেন রাইচাঁদবাবুকে। সব থেকে বড় কথা সেই সময় আকাশবাণীতে বীরেনবাবু ছাড়া ধারাভাষ্যের উপযুক্ত মানুষ আর কেউ ছিলেন না। কর্তৃপক্ষ সেটা জানতেন, তাই ফুটবল বিষয়ে বীরেনবাবুর অজ্ঞতার কথা জানা সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষ তাঁকেই পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, প্রথমদিনের বাংলা ধারাবিবরণী এইভাবেই উতরে গেল। ইতিহাস বলছে, সেই ১৯৩৪-এর পর, ১৯৪৮ সালে খেলোয়াড় নির্মল চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে ধারাবিবরণী দেওয়ানো হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রয়াসও তেমনভাবে সারা ফেলেনি। অবশেষে বাংলা ধারাবিবরণী সম্প্রচারের সঠিক চিত্র পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালের ১৫ জুলাই, অজয় বসু ও পুষ্পেন সরকারের কণ্ঠে। প্রথম দিনই বাজিমাত। নিজের ভাষায় ধারাভাষ্য পেয়ে শ্রোতারাও খুশি হলেন।

এবার আসি ভাষ্যকার অজয় বসুর নানা কথায়। মাঠ থেকে ধারাভাষ্য শুনে তো আমরা উত্তেজিত, কিন্তু কেমন ছিল সেই পরিবেশ? অজয়বাবুর কথা থেকে জানা যাচ্ছে, মাঠের গ্যালারির মাথায় এক কোণে ছোট্ট চিলেকুঠুরিতে বসে মাইক্রোফোনে কথা বলতে হতো। কুঠুরিটি রীতিমতো হালকা। একটু জোরে হাওয়া দিলেই কুঠুরিটি দোলে। শুধু হাওয়া নয়, গোল হলে আনন্দে দর্শকরা যখন উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেন, তখন তো কথাই নেই। বাক্সটি খুবই ছোট, তারই মধ্যে প্রায় ৫-৬জন মানুষ। বাক্সের সামনে ছোট্ট ঘুলঘুলি, তাতেই মাঠের ছবি দেখে বলে যাওয়া। কাঠের পলকা বাক্স, প্রাকৃতিক আর পরিস্থিতি, দুইয়ের হাওয়ায় বাক্সের দুলুনি সবই মানিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু আনন্দের উত্তেজনায় গ্যালারির বেঞ্চে দর্শকেরা দাঁড়িয়ে পড়লেই ভাষ্যকারের চোখে অন্ধকার। না দেখতে পেলে কী বলবেন! থামাও, সম্ভব নয়। বানিয়ে বললেও বিপদ। তখন মাঠের দর্শকরাই বলে বসেন 'কী গুল মারছেন দাদা।' এখানেই শেষ নয়, খেলার হার-জিতের পর মাঠের দর্শকদের কুরুচিকর মন্তব্যও বেতারের মাইক্রোফোনে ধরা পড়ে। সেসব বিষয় নিয়ে আকাশবাণীতে চিঠিপত্রও আসতে থাকে। তাছাড়া এর পাশাপাশি দর্শকদের সরাসরি হুমকি তো ছিলই।

ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটের ধারাবিবরণীও বেতারে প্রচারিত হতো। চারের দশকে এই সম্প্রচার হতো তৎকালীন বোম্বে কেন্দ্র থেকে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-এ প্রথম ভারতীয় স্তরে টেস্টম্যাচের বেতার বিবরণ সরাসরি মাঠ থেকে প্রচারিত হয়। সে বিবরণী অবশ্যই ইংরেজিতে ছিল। পরবর্তীতে ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও ১৯৫৯ সাল থেকে বাংলাতে ধারাভাষ্য শুরু হয়। 'রাজার খেলা' রাজার ভাষাতেই শুনতে ভালো লাগবে, এই চিন্তাধারাকে প্রথমদিনই কলকাতা বেতার ভাঙতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেছে গ্রামের মানুষ, যাঁদের নিজস্ব ট্রানজিস্টার নেই, তাঁরা খেলা শোনবার জন্য দোকানের সামনে ইঁট পেতে জায়গা রেখে যেতেন। আজ অবস্থার পরিবর্তন হলেও, সেই সময় এই বাংলা ধারাবিবরণীর মাধ্যমে বাংলা শব্দকোষে যুক্ত হয়েছিল বেশ কিছু নতুন শব্দ। বিশেষ করে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে কিছু শব্দ যেমন— ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, গালি, মিড অফ প্রভৃতি শব্দগুলো ইংরেজিতেই বলা হতো। তবে এই ধারাভাষ্যে বেশ কিছু সুন্দর প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হতে শুরু করে যা আজও শোনা যায়। যেমন, রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা (ডিফেনসিভ), পিছিয়ে এসে মারা (ব্যাকফুট), তালুবন্দি (ক্যাচ ধরা) ইত্যাদি। ফুটবলের ধারাভাষ্যে অজয় বসু ও পুষ্পেন সরকার যেমন খুব পরিচিত নাম, তেমনই ক্রিকেটে কমল ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

খেলার এই ধারাভাষ্য এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, সেই সময় এই ধারাভাষ্যকে কেন্দ্র করে বহু কৌতুকনকশা রেকর্ডবন্দি হয়েছে, বিভিন্ন সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছে ধারাভাষ্যের দৃশ্য ('ধন্যি মেয়ে', 'ওরা থাকে ওধারে'), এমনকী নান্দীকার প্রযোজিত নাটক 'ফুটবল'-এর সূচনাতেও রাখা হয়েছিল ধারাভাষ্যের রেশ। সেই রেশ নিয়েই শেষে বলি, আজকের মতো পরিসর শেষ, পেনাল্টির সুযোগে, রেফারির হুইসেলে, কলেবর বৃদ্ধি আজও সাদা কাগজের জালে বন্দি হল। গো-ও-ও-ও-ল!

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

গ্রন্থসাহেবের বাগান

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

কিছুদিন আগের কথা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা বাড়িতে থাকছিলাম তখন। বাড়িটার সামনে একটা প্রকাণ্ড বাগান। বড় বড় নিম, পাকুড়, তেঁতুল, জাম গাছ। যেন কোনও জঙ্গলের সামনে আছি মনে হতো। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে একটা কানাগলি বেরিয়ে ওই জঙ্গলের সামনে শেষ হয়েছে। সেই কানাগলিটার নাম লাভলক প্লেস। বেশ চমকপ্রদ নাম। গলিটার একদিক বন্ধ। ফলে গলিটা লক তো বটেই। সেটার নাম তাই দিয়েছে লাভলক প্লেস। সেই বন্ধ প্রেমের গলির একেবারে শেষ বাড়িটার একটা ফ্ল্যাটে আমি থাকতাম। এই মাত্র দশ বছর আগে। কলকাতায় সবুজ যখন অবলুপ্ত। দারুণ শ্বাসকষ্টে যখন জর্জরিত শহর। সেইসময় আমার বাড়ির সামনে একটা প্রায় জঙ্গল রয়ে গিয়েছে।

রাতে বাদুড়, পেঁচা উড়ত সেখানে। শোনা যেত নানারকম বুনো জন্তুর ডাকও। দিনেরবেলায় ডাকত শিয়াল। দেখা যেত ভাম, মেছো বিড়াল। আমার খুব উদ্বেগ হতো। আমি ভাবতাম এই জঙ্গল যখন কেটে সাফ করে এখানে বহুতল উঠবে অথবা শপিংমল তৈরি হবে তখন গাছগুলো তো কাটা পড়বেই সেইসঙ্গে এইসব বাদুড়, পেঁচা, শিয়াল, মেছো বিড়াল এরাও এদের ঘর-সংসার হারিয়ে ভেসে যাবে।

মনে হতো এতদিন এই জঙ্গল অক্ষত রয়েছে কী করে? কেউ কি তাহলে কোর্টে গিয়ে দরবার করে জঙ্গলকে প্রোমোটারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে?

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালকে জানালে অনেকসময় ভালো ফল হয়। তাদের হস্তক্ষেপে প্রায়ই সবুজ আর বন্যপ্রাণ বেঁচে যায় কাগজে পড়ি। এই জঙ্গলটার ক্ষেত্রে হয়তো তেমন কিছু হয়েছে। না হলে বালিগঞ্জে এতখানি জঙ্গল নিশ্চয় এতদিন পড়ে থাকত না।

সকালবেলা অজস্র পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে আমার। হরিয়াল, ফিঙে, দোয়েল কত পাখি। টিয়ার ঝাঁক উড়ে যায় সামনে দিয়ে। হনুমান আসে মাঝেমাঝে দল বঁধে। আমি বারান্দা দিয়ে দেখি তাদের।

হু হু করে হাওয়া দেয় এখানে। সারাদিন-রাত এখানে এমন ঠান্ডা উতল একটা হাওয়া বইতে থাকে।

জায়গাটা পঞ্জাবি অধ্যুষিত। অদূরে রয়েছে পঞ্জাব ক্লাব। লাভলক প্লেস বলে ছোট রাস্তাটাতে একজনও বাঙালি নেই। পাড়াটাই পঞ্জাবি পাড়া। হঠাৎ মনে হবে যেন দিল্লির গুরগাঁও বা করলবাগে রয়েছি এমন পরিবেশ।

পাশের ফ্ল্যাটে থাকে একটি পঞ্জাবি পরিবার। তারা বেশ খোসমেজাজি আর আমোদপ্রিয়। হইচই ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে জোরে ডিজে বাজে তাঁদের ফ্ল্যাটে। আমার ভালোই লাগে। যে কোনও আনন্দ আমার মনে প্রসন্নতা আনে। আমি বেশ উপভোগ করি।

একদিন পাশের বাড়ি থেকে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেল। ওদের বাড়িতে পুজো। আমাদের সবাইকে বলে গেলেন ওঁরা। এটাও বলে গেলেন যে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষ সকলে যেন মাথা ঢেকে যাই সেদিন। কারণ এটা ওঁদের ধর্মীয় সংস্কার।

গিয়ে গুরু নানকের ছবিতে প্রণাম করলাম। কত রকম যে রান্না ওঁরা করেছিলেন সেদিন। পোলাও, পনিরের কাটলেট, কালো ডাল, ছানার চপ, হালুয়া কত কী...

আমার সঙ্গে পাড়ার সকলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের গৃহকর্ত্রী মনপ্রীত কাউর। মনপ্রীত খুবই উঁচু মনের মহিলা। তাঁর সঙ্গে ভাব করা সহজ। বেশ ভাব হয়ে গেল মনপ্রীতের সঙ্গে। ও একটা নামী ব্যাংকের ফিনানশিয়াল অ্যাডভাইসার। ছুটির দিনে দুপুরে মাঝে মাঝে মনপ্রীতের সঙ্গে আমার গল্প হতো। মনপ্রীত বলত যে ওর বাবা-মা ও একসময় থাকত দিল্লি সন্নিহিত গুঁরগাওতে। ওর শ্বশুরবাড়িও দিল্লিতে। তখন ওর সবে বিয়ে হয়েছে সেইসময় হঠাৎ একদিন গুরগাঁওয়ের সমস্ত বাড়ির আলো নিভে গেল। সেটা ছিল উনিশশো চুরাশি সালের একত্রিশ অক্টোবর। নিজের শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারালেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধি। শুরু হল শিখদের মার। উন্মত্ত জনতাকে কিছুতেই রোখা গেল না। মনপ্রীত আমাকে বলল 'কেন মানুষ অপরাধীর জাত দেখে বলো তো?'

মনপ্রীত আর তার ভাই-বোনেরা এরপর কলকাতায় পালিয়ে আসে বাবা-মায়ের সঙ্গে। ওর স্বামী চুরাশির দাঙ্গায় প্রাণ হারান। কলকাতায় তখন অনেক শিখ পালিয়ে এসেছিল। কংগ্রেস শাসিত নয় এমন রাজ্যগুলোতে তখন পালিয়ে আসছিলেন শিখরা।

কলকাতায় এসে আস্তে আস্তে বিভীষিকা কাটিয়ে জীবনে ফেরেন মনপ্রীতরা। ওঁর বাবা-মা একে একে চলে যান। ভাইবোনদের বিয়ে হয়। এখন ভাই, ভাইয়ের বউ আর ভাইপো, ভাইঝিদের নিয়ে ভালোই আছেন মনপ্রীত।

একদিন মনপ্রীতকে বললাম, 'এখানে এরকম একটা প্রায় জঙ্গলের মতো এতবড় জায়গা রয়েছে। প্রোমোটার নিতে চায়নি এটা?'

মনপ্রীত অবাক হল। 'ও, তার মানে তুমি জানো না ওই বাগান নিয়ে কত কী হয়েছে।'

'আমি তো বেশিদিন এখানে আসিনি তাই জানি না হয়তো। নিশ্চয় কেসটেস হয়ে ওখানে প্রোমোটারি বন্ধ করে দিয়েছে।'

মনপ্রীত বলল, 'না কোনও কেস হয়নি। আমরা এখন যে-ফ্ল্যাটে থাকি সেটা আগে ছিল হরকিষেন সিং গুরমুখ নামে এক পঞ্জাবির মস্তবড় বাড়ি। পঞ্জাবে হরকিষেনজির অনেক জমিজমা ছিল। এদিকে পঞ্জাব যখন জ্বলছে সেই সাতাশি-অষ্টআশি সালে। কলকাতায় পঞ্জাবিদের তখন নানারকম ছোটবড় অপমান সইতে হতো। অনেকে মনে করত, পঞ্জাবি মানেই হাতে বন্দুক তুলে নেওয়া সন্ত্রাসবাদী। পঞ্জাবিদের নিয়ে মজার মজার জোক ছড়িয়েছিল কলকাতায়। তাতে মজা থাকলে দোষ ছিল না কিন্তু একটা জাতিগত বিদ্বেষ নিহিত ছিল সেইসব মজাতে।

এরমধ্যে একদিন চন্ডিগড়ে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারাল তিরিশজন বাঙালি পর্যটক। যারা গুলি করেছিল তারা জন্মসূত্রে শিখ ধর্মের মানুষ ছিল।

সেদিন কলকাতায় নিজের ব্যবসাস্থলে হরকিষেন মার খেলেন। তাঁকে তাড়া করল একদল লোক। তাঁর পাগড়ি খুলে নিল। পাঁক ঢেলে দিল তাঁর মাথায়। একটা বড় ট্রাভেল এজেন্ট কোম্পানি চালাতেন হরকিষেন। সমাজে তাঁর যথেষ্ট মানসম্মান ছিল।

সেদিন রাতে ফিরে হরকিষেন আত্মহত্যা করেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তার সঙ্গে ওই জঙ্গলের কী সম্পর্ক।'

মনপ্রীত জানালেন। বহু বছর আগে ওই জমিতে এত গাছ ছিল না। অনেকটা ফাঁকা জমি আর কিছু গাছপালা নিয়ে একটা জায়গা হরকিষেন কিনে নিয়েছিলেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল ওখানে আরও গুরুদ্বার বানাবেন। তিনি জমিটাকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। যাকে আমরা দেবোত্তর সম্পত্তি বলি সেটাই করেছিলেন হরকিষেন। তারপর তিনি তো নিজেই সরে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। ওঁর ছেলেরা জমিটা বেচতে চাইল। একটা বড় রিয়াল এস্টেট কোম্পানিকে বকলমে বেচল জমিটা। কারণ দেবোত্তর করা সম্পত্তি আইনত বিক্রি করা খুব কঠিন। কিন্তু কোম্পানি থেকে জমি যেই কেউ ঘিরতে আসেন একটা না একটা অঘটন ঘটে। কখনও কোনও মিস্ত্রি ইলেকট্রিক শক খায় তো কখনও গাছের ডাল মাথায় পড়ে কেউ আহত হন। তারপর হঠাৎ সেই প্রসিদ্ধ রিয়াল এস্টেট কোম্পানির মালিক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান।

এদিকে ততদিনে জমির পেছনে বসে পড়ে কিছু গরিব মানুষ। তাঁদের তুলে জমিতে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এদিকে পাড়ার লোকের নজর পড়ে যে দেবোত্তর করা জমিতে প্রোমোটারি করবার তোড়জোড় চলছে।

পাড়ার পঞ্জাবিরা বাধা দেন। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা চিঠি লেখেন। দেবোত্তর সম্পত্তিতে বহুতল নির্মাণ করা যায় না ফলে কাজ আটকে পড়ে থাকে বছরের পর বছর। জায়গাটা গাছে গাছে ঢেকে যায়। বন্যপ্রাণীতে ভরে ওঠে।

রাত্রিবেলা বারান্দায় বসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এখানে একটা গুরুদ্বার করতে চেয়েছিলেন হরকিষেন সিং গুরমুখ। তা করা সম্ভব হয়নি কিন্তু তার বদলে জায়গাটায় কত গাছ হয়েছে। কত ঘরছাড়া পশুপাখি এখানে আশ্রয় পেয়েছে। রোজ কত পাখি আসে এখানে, কত কাঠবিড়ালি, মেছো বিড়াল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরচেয়ে বড় ধর্ম কোনও ধর্মস্থান নির্মাণ করেই সম্ভব হতো না।

আমি বাড়িটাতে ছিলাম বিশেষ কারণবশত একমাসের জন্যে।

যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে আসছি মনপ্রীতের বাড়ি গিয়ে ওদের সিংহাসনের ওপর রাখা গ্রন্থসাহেবকে প্রণাম করে মনে মনে বললাম। 'ওগো নানক ঠাকুর, তুমি এখানকার জঙ্গলটাকে দেখো। এখানকার পশুপাখিদের দেখো। আর মনপ্রীতকেও ভালো রেখো। এই লাভলকের গলিকে ভালো রেখো।' হাওয়ায় একটু একটু উড়ছিল গ্রন্থসাহেবের চাপা দেওয়া পাতাগুলো। গ্রন্থসাহেবের পাতা থেকে যেন আলতো করে আশীর্বাদের হাত তুললেন গুরু নানক।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
কলকাতা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

লেটনাইট পার্টি

সৈকত ঘোষ

কলাকাতা শহরের রক্তেই আছে দ্রুত বদলে যাবার অভ্যেস। তবে শেষ কয়েক দশকের বদলটা যেন অতিদ্রুত। ঘরোয়া মেয়ে-বউদের পান বা দোক্তা খাবার রীতি বা বড়জোর গুরাখু, অনেক বছর আগেকার ট্র্যাডিশন। তবে শেষ কয়েক দশকে ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েদের বিনোদনের উপকরণও বদলেছে খুব দ্রুত। আমূল পরিবর্তন এসেছে লাইফস্টাইলে।

সমীক্ষা বলছে, রাতের মধ্যে একটা অন্যরকম ফ্যাক্টর আছে। রাত মানেই একটা নেশা নেশা, আগুন আগুন ব্যপার। রাত মানেই হ্যালুসিনেশন। ২০০০-এর শুরুতেই রাত নিয়ে গান গাইতে উঠে শিলাজিৎ বলেছিলেন, 'রাত বড়ো দস্যি/মায়াবী রাত/রাত আমি চেটেপুটে খাই'। স্যাটারডে নাইট মানেই অনেকের কাছেই এক কথায় 'পার্টি তো বনতা হ্যায়'। আর সেইদিকে তাকিয়ে চিল আউট হওয়ার সমস্ত উপকরণ নিয়ে সেজে ওঠে রাতের কলকাতা। এই হল বর্তমানের প্রেক্ষাপট।

লেটনাইট পার্টি মূলত পশ্চিমি কালচার। সারা সপ্তাহ কাজের পর উইকএন্ডে জমিয়ে আনন্দ করার কনসেপ্ট থেকেই এই লেটনাইট পার্টির আবির্ভাব। প্রচণ্ড কাজের চাপ থেকে রিল্যাক্স হতে বা কর্পোরেট সেক্টরের স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে একটু হালকা হতে এই প্রজন্মের প্রথম পছন্দ লেটনাইট পার্টি। লেটনাইট পার্টির বেশ কয়েকটি দিক আছে তবে প্রথমেই আসবে এর ম্যাগনেটিক আকর্ষণ। বেড়া ভাঙার এক অদ্ভুত আনন্দ। আনলিমিটেড গ্ল্যামার রং-বেরঙের পানীয় সাথে সুস্বাদু খাবার-দাবার এবং অবশ্যই আনলিমিটেড ফান। তবে লেটনাইট পার্টির মূল আকর্ষণ মিউজিক, ডান্সফ্লোর এবং ড্রিংকস। মনকে পালকের মতো হালকা ফুরফুরে করতে এর কোনও বিকল্প নেই। তবে কিছু জিনিস যখন হ্যাবিট হয়ে যায় তখন তা হয়ে ওঠে মাথাব্যথার কারণ। একেই বলা হয় addiction। এই addiction কোনও পারফিউম ব্র্যান্ড নয় এ নেশা বড় ভয়ংকর। একটা মানুষকে শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সে রাজা উজির যাই হোক না কেন।

'৮০-র দশকের শেষ দিক থেকেই সমাজটা খুব তাড়াতাড়ি বদলে যেতে শুরু করে। বদলে যায় আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। একদিকে ওপেন মার্কেট, বিশ্বায়নের এফেক্ট অন্যদিকে মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। আর এর ফলে বদলে যায় আমাদের টোটাল লাইফস্টাইল। এক শ্রেণির মানুষের হাতে আসতে থাকে অপ্রতুল টাকা। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে শিল্পে জোয়ার আসে। বাড়তে থাকে কর্মসংস্থান। আর টেকনোলজির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মানুষের স্ট্রেস। সারাদিন কাজের শেষে মানুষ খুঁজতে থাকে একটু রিফ্রেশমেন্ট। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো এন্টারটেইনমেন্ট হয়ে ওঠে পার্ট অব দ্য লাইফ। বেসিক নিডস। এই সময়ে ভারতীয় সিনেমায় মূলত বলিউডের দৌলতে ডিস্কো কালচার হয়ে ওঠে হট ফেভারিট। বোম্বেতে খুলতে থাকে একের পর এক ডিস্কো, পাব, নাইট-ক্লাব। রাতের মুম্বইতে উড়তে থাকে কোটি কোটি টাকা। বড় বড় বিজনেস ইভেন্ট, ফিল্ম প্রিমিয়ার বা আফটার পার্টির মেহেফিলে এক বুক মুক্ত বাতাসের মতো আকর্ষণ কেড়ে নেয় আইক্যান্ডিরা। আইক্যান্ডি হল লাস্যময়ী নারী, যারা পার্টিতে হয়ে ওঠে গেস্টদের চোখের আরাম। হু হু করে বাড়তে থাকে বার-ড্যান্সারদের চাহিদা।

নব্বইয়ের মাঝামাঝি থেকে কলকাতাতেও ঢুকে পড়ে লেটনাইট পার্টি কালচার। পার্ক স্ট্রিটের 'তন্ত্র', 'সামপ্লেস এলস' এবং 'রক্সি' হল কলকাতার সবচেয়ে পুরনো নাইটআউট প্লেস। এখানকার অ্যামবিয়েন্স মিউজিক ড্রিংকস এবং অবশ্যই খাবার-দাবার এক কথায় লা-জবাব। অবশ্য ২০০০-এর পর থেকে সিনারিওটা বদলাতে শুরু করে। কলকাতার জেন ওয়াই-এর কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয় লেটনাইট মস্তি কা পাঠশালা। ইনফরমেশন টেকনোলজির ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে কলকাতায় খুলে যায় কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ। প্রায় ১০ বছরের মধ্যে কয়েক লক্ষ আইটি ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে বেরোয় এবং কলকাতার সেক্টর ফাইভ-এ বেশ কিছু আইটি কোম্পানিতে চাকরি করতে শুরু করে। এদের জীবনযাপনের সাথে গাঁটছড়া বাঁধে এই নাইটআউট কালচার। কলকাতায় খুলতে থাকে একাধিক ফাইভ স্টার এবং তাদের সাথে ডিস্ক। JW Marriott এর 'গোল্ড ক্লাব', ITC Sonar-এর 'ডাবলিন', Hotel Hindusthan International-এর 'আন্ডার গ্রাউন্ড', নোভোটেল এবং হায়াতের ডিস্ক— এক কথায় আলটিমেট নাইট আউট ডেস্টিনেশন। এইসব জায়গার ঝলমলে জীবন হতে পারে আপনার মনখারাপের ওষুধ। চাপের জীবনে আপনাকে স্ট্রেস ফ্রি করে পুরো বিন্দাস করে দিতে পারে। হয়ে উঠতে পারে আপনার রিফ্রেশমেন্ট। তবে জীবনকে আর একটু রঙিন করতে চাইলে কলকাতার সবচেয়ে সুন্দর রুফ টপ বার উইথ পুল 'smoke shack' থেকে একবার ঘুরে আসতেই হবে। এছাড়া পার্ক সার্কাসের 'Club Boudoir' হতে পারে আপনার হট ডেস্টিনেশন। আর প্রাণ খুলে নাচা-গানা করতে চাইলে পার্ক স্ট্রিটের পার্ক হোটেলের 'Aqua Poolside Lounge' আপনার জন্য বেস্ট প্লেস। ক্যামাক স্ট্রিটের 'Shisha', এলগিন রোডের ফোরাম মলের 'Privy', বালিগঞ্জ পার্ক-প্লাজার 'Nirvana', প্রিয়া সিনেমার কাছে 'Vault' এবং অবশ্যই পার্ক স্ট্রিটের 'Tantra' কলকাতার পাইওনিয়ার নাইট আউট স্পট। পকেট একটু গরম থাকলে আর লেটনাইট পার্টির শখ থাকলে একবার যে কোনও একটা অপশন চুজ করে ঘুরে আসতেই পারেন। কথায় আছে সব কিছুর টেস্ট থাকা ভালো।

তবে হ্যাঁ, এ-পার্টির বেশ কিছু খারাপ দিকও আছে। সবচেয়ে মারাত্মক দিক হল, স্বাভাবিক বায়োলজিকাল ক্লককে হ্যাম্পার করা। ঘুম এবং হজমের ওপর এর ভয়াবহ এফেক্ট। অতিরিক্ত নেশা নার্ভাস সিস্টেমকে উইক করে দেয়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়। রাত জেগে পার্টি করা হতে পারে ক্রনিক অবসাদের কারণ। এর ফলে তৈরি হয় রিলেশনশিপে সমস্যা। ক্ষতিগ্রস্থ হয় স্বাভাবিক সামাজিক মূল্যবোধ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় টিনেজাররা বিপথে চালিত হচ্ছে। সঙ্গদোষে কেরিয়ারের ফোকাস নষ্ট হবার সম্ভাবনাও প্রবল। মনোবিদরা বলেন, কোনও কিছুই অতিরিক্ত মাত্রায় ভালো নয়, সবকিছুর মধ্যেই একটা সংযম এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। মাঝে মাঝে রিফ্রেশমেন্টের জন্য লেটনাইট পার্টি ঠিক আছে কিন্তু কোনওভাবেই একে জীবনের অভ্যেস বানাবেন না। কারণ যে কোনও অভ্যেস জন্ম দেয় addiction যা একটা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

বদলে যাওয়া সময়ের অবয়বে রুচিবোধ পালটেছে মানুষের। আপডেটেড হচ্ছে সমাজ। অভ্যাস বদলাচ্ছে, 'ওপেন মাইন্ডেড' নামক শব্দটির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। এখন সময় বলবে এ সংকেত আলোর নাকি সীমাহীন অন্ধকারের?

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

বিনোদন

বুদ্ধদেব হালদার

এই একবিংশ শতকে জিও-ফোর জি-র দুনিয়ায় ক্রমশ বদলে যাচ্ছে মানুষের রুচি। পালটে যাচ্ছে বিনোদনের উপকরণ। ছোট থেকেই প্রযুক্তির রদবদল আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখছে, তাই আজকের দিনে জীব-জন্তুর খেলা হোক বা সার্কাস, দেখার সময় বা রুচি মানুষের কাছে খানিকটা অলীক ব্যাপারই বটে।

অবশ্য এককালে আমাদের এই কলকাতার সার্কাস মানে যে বিশ্বসংস্কৃতিতে বাঙালির কী ভীষণ দাপটচিত্র ও অহংকার প্রদর্শনের জায়গা ছিল, তা আজকের জেনারেশন কল্পনাও করতে পারবে না। একসময় বাংলার সব থেকে বড় এন্টারটেনমেন্ট বলতে বোঝাত এই সার্কাসের খেলাকেই। শুধুমাত্র নির্মল আনন্দ বা চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ ঘটনা হিসাবেই তা পরিবেশিত হতো না। অনেকক্ষেত্রেই পরাধীন ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলার স্ট্র্যাটেজি হিসাবেও বিভিন্ন সংস্থা সার্কাসের খেলাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেসময় দেখাতে শুরু করেছিল। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটি বিনামূল্যে ও টিকিট ছাড়া হওয়াতে একশো বছর আগে বাঙালির সার্কাসের প্রতি টানটা ছিল অনেকটা আজকের ভারতীয়দের তুখোর সাউথ ইন্ডিয়ান সিনে-ম্যানিয়ার মতোই।

বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত এই 'সার্কাস' শব্দটি আসলে একটি ইংরেজি শব্দ। অবশ্য ইংরেজি 'সার্কাস' ল্যাটিন ওয়ার্ড 'circus' থেকে উদ্ভূত। এই ল্যাটিন শব্দটি আবার গ্রিক 'kipkos' থেকে এসেছে যার আক্ষরিক অর্থ বৃত্ত বা রিং। সার্কাসে কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের খেলা প্রদর্শন করতেন। এই খেলা প্রদর্শনের জন্য যে-গোলাকার মঞ্চের প্রয়োজন হয়, তাঁকে 'রিং' নামে অভিহিত করা হয় এবং খেলাটি সার্বিকভাবে যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে রিংমাস্টার বলা হয়ে থাকে। পুরো খেলাটি একটি বড় তাঁবুর ভিতরে হয়, এই তাঁবুকে বলা হয় 'বিগ টপ'। বাংলায় প্রথম সার্কাস আবির্ভাবের ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ ঘটনা। তবে বাংলায় সার্কাসের ইতিহাস জানতে হলে সবার প্রথম যে-ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের কিছুটা হলেও জেনে রাখতে হবে তিনি হলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪)। তিনি ছিলেন হুগলি জেলার কোন্নগরের মিত্তিরবাড়ির ছেলে। নবগোপাল মিত্র প্রথমে কলকাতার হিন্দু স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর কিছুদিন আইন নিয়েও পড়াশোনা করেন। কিন্তু এক সময় তাঁর মাথায় স্বদেশির ভূত চাপল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। ঠিক সেই কারণেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। এমনকী ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের বিবাদ তুঙ্গে উঠলে তিনি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনিই প্রথম সাধারণ মানুষের মনে দেশপ্রেম ও স্বদেশি ভাবনা জাগানোর পরিকল্পনায় ও এদেশি সংস্কৃতিকে বিশ্ববাসীর কাছে মেলে ধরার জন্য ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা শুরু করেন। প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন এই মেলা বসত। ১৮৭৫ সালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি মেলায় পাঠ করেন। শুধু স্বদেশি মেলা নয়, তিনি স্বদেশি সার্কাসও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর উদ্যোগেই প্রথম 'ন্যাশনাল সার্কাস' তৈরি হয়। কলকাতা শহরে বাঙালিদের তৈরি এটিই ছিল প্রথম সার্কাস।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরোয়া' বইটিতে সার্কাসের গোড়াপত্তনের কাহিনিটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, 'বাবামশায় তখন মারা গেছেন, নবগোপাল মিত্রর বৃদ্ধ অবস্থা, তখনও তাঁর শখ একটা না একটা কিছু ন্যাশনাল করতে হবে। আমরা তখন বেশ বড় হয়েছি, একদিন নবগোপাল মিত্তির এসে উপস্থিত; বললেন, একটা কাণ্ড করেছি, দেশি সার্কাস পার্টি খুলেছি। ও ব্যাটারাই সার্কাস দেখাতে পারে, আর আমরা পারিনে, তোমাদের যেতে হবে। আমি বললুম, সে কী কথা, সার্কাস পার্টি! মেম যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নাচে, সে কোথায় পাবেন আপনি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সব জোগাড়-যন্তর করেছি, শিখিয়েছি, তৈরি করেছি কেমন সব দেখবেখন। গেলুম আমরা নবগোপাল মিত্তিরের দেশী সার্কাস পার্টিতে। না গিয়ে পারি? একটা গলিজ জায়গা; গিয়ে দেখি ছোট্ট একখানা তাঁবু ফেলেছে, কয়েকখানা ভাঙা বেঞ্চি ভিতরে, আমরা ও আরো কয়েকজন জানাশোনা ভদ্রলোক বসেছি। সার্কাস শুরু হল। টুকিটাকি দুটো একটা খেলার পর শেষ হবে ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে। দেশি মেয়ে ঘোড়ার খেলা দেখাবে। দেখি কোত্থেকে হাড়গোড় চেহারার একটা ঘোড়া ধরে আনা হয়েছে, মেয়েও একটি জোগাড় হয়েছে; সেই মেয়েকে সার্কাসের মেমের মতো টাইট পোশাক পরিয়ে সাজানো হয়েছে। দেশি মেয়ে ঘোড়ায় চেপে তো খানিক দৌড়ঝাঁপ করে খেলা শেষ করলে। এই হল দেশি সার্কাস।'

শুরুটা ঠিক এরকমভাবে হলেও সেসময় কিছুদিনের মধ্যেই সার্কাস বাঙালিদের অন্যতম সেরা বিনোদন হয়ে উঠল। ফরাসি সার্কাস খেলার অনুকরণে বাংলাতেও চালু হল 'ফ্লায়িং ট্রাপিজ'। এটি এক ধরনের দড়ির খেলা। এক স্থান থেকে দড়ির সাহায্যে উড়ে অন্যস্থানে চলে যাওয়াই এই খেলার চমক। দীর্ঘ অনুশীলন ও অভ্যাসের মাধ্যমেই একমাত্র এই খেলা দেখানো সম্ভব হতো। ১৮৫৯ সালে ফরাসি রিংমাস্টার জুল লিয়োটার্ড প্রথম এই খেলার প্রচলন করেছিলেন। কলকাতায় সার্কাস ঠিক এভাবেই বাঙালিদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল। এরপর কলকাতায় ইংরেজদের দেখিয়ে বাঙালিদের এই সার্কাস খেলা দেখানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রায় প্রত্যেক বছর নিয়ম করে দেখানো হতো রাশিয়ান সার্কাস। এই জায়গার নামকরণও ওই সার্কাস প্রদর্শনের ঘটনাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। সেই থেকেই শুরু করে নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক পর্যন্তও প্রতি বছরের শীতের আমেজ জমিয়ে রাখত পার্ক সার্কাস ময়দান। অবশ্য এখন আর এসবের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

নবগোপাল মিত্রের সেই 'ন্যাশনাল সার্কাস' দিয়েই বাঙালির সার্কাস যাত্রা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবগোপাল মিত্রের পর সেরকমভাবে এ-বিষয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি। অবশ্য 'ন্যাশনাল সার্কাস'-এর পর খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও খ্যাতি কুড়িয়েছিল 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'। তবে, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় এই দলটি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। যদিও এরপরেই আসে বাঙালির সার্কাসের স্বর্ণযুগ। কারণ, সে সময় প্রিয়নাথ বসুর 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' (১৮৮৭) শুধু বাঙালিকেই নয়, আন্দোলিত করেছিল সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকেই। তিনি তাঁর দল নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। 'প্রোফেসর বোসের অপূর্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) বইটিতে এ-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য প্রমাণাদি উল্লেখ করা আছে। প্রিয়নাথ বসু (১৮৬৫-১৯২০) ছিলেন সে সময়ের নামকরা নাট্যকার মনোমোহন বসুর সুপুত্র। নবগোপালের সার্কাস বিনোদন যখন প্রায় ধ্বংসোন্মুখে পতিত, ঠিক তখনই তিনি দায়িত্ব নিয়ে আবার জাগিয়ে তুললেন। নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল সার্কাসের সমস্ত জিনিসপত্র তিনি কিনে ফেললেন। এছাড়া গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসেরও বেশ কিছু জিনিস তিনি কিনে নিলেন। শুরু করলেন শহরের বিভিন্ন জায়গায় খেলা দেখানো। তৈরি হল 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস টিম'। তাদের খ্যাতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু (১৮৯৬-১৯৩৯)-এর লেখা 'বাঙালির সার্কাস' বইটি থেকে জানা যায় রেওয়ার মহারাজা একবার গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের খেলা দেখতে আসেন। খেলা দেখে তিনি এতটাই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, গ্রেট বেঙ্গলকে উপহারস্বরূপ তিনি দুটো বাঘ দিয়েছিলেন। ভারতের বিনোদন ইতিহাসে সেটিই ছিল প্রথম সার্কাস যেখানে বাঘের খেলা দেখানো সম্ভবপর হয়েছিল। বিভিন্ন বই থেকে জানা যায় এই দুটি বাঘের একটির নাম ছিল লক্ষ্মী এবং অন্যটির নাম ছিল

নারায়ণ। বেঙ্গল সার্কাস ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি শহরেই তাদের খেলা দেখানোর সুযোগ পেয়েছিল। প্রিয়নাথ বসুর গ্রেট বেঙ্গল প্রায় ১৮ বছর ধরে খ্যাতির শীর্ষাসনে ছিল। ১৮৮৭ সাল থেকে তাঁরা প্রায় ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

প্রিয়নাথের দল শুধুমাত্র খেলা দেখানোর জন্যই এত বিখ্যাত হননি। সেসময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইংরেজরা বাংলাকে ভেঙে দু'টুকরো করতে চাইছেন। আর ঠিক তখনই খেলার ফাঁকে ফাঁকে প্রিয়নাথবাবুর দল দেশপ্রেমের প্রচার করে যাচ্ছেন ভারতের সর্বত্র। বলে যাচ্ছে সমগ্র জাতির ঐক্যের কথা। সার্কাস শুরু হওয়ার আগেই গাওয়া হতো স্বদেশি গান— 'ভারত সন্তান সব/জাগ রে জাগ আজ।' সেই সময়ের বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও তাঁর সার্কাস দেখতে আসতেন। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছিলেন, 'প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসে বাঘের খেলা দেখিয়ে হাজার হাজার মানুষের হাততালি কুড়োতেন যিনি, তার নাম বাদলচাঁদ।... দর্শকরা ভয়ে আঁতকে উঠত। এই রে, বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবার আর বাঁচোয়া নেই।... বাদলচাঁদ তবু তো ছেলে। কিন্তু তাকেও যে হার মানাল, সে এক মেয়ে। নাম সুশীলাসুন্দরী। মিস্ সুশীলাসুন্দরী। বাঘের গালে চুমো খাচ্ছে এক মহিলা, এই দৃশ্য দেখে তখনকার মানুষজন থ। ইংলিশম্যান তখনকার কালের নামজাদা কাগজ। তারা পর্যন্ত সুশীলাসুন্দরীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।' এছাড়াও এই গ্রুপেই দুটি বিখ্যাত হাতির কথা জানা যায়। একজনের নাম চুনী, অপরজন গোল্ডি। জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখাত সুশীলাসুন্দরীর বোন কুমুদিনী। পরবর্তীকালে এই সার্কাসে পেন্টার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত যাদুকর সরকার। সার্কাসের ইতিহাসে তাই গ্রেট বেঙ্গল এক অবশ্য উচ্চার্য নাম। বিদেশের মাটিতে মালয়ে ২১ মে ১৯২০ সালে অসুস্থ হয়ে প্রিয়নাথ বসুর মৃত্যু ঘটে। আর তারপর থেকেই সার্কাসের গোল্ডেন পিরিয়ডের সমাপ্তি শুরু হয়ে যায়।

এরপর বিক্ষিপ্তভাবে 'দ্য লায়ন সার্কাস' (১৯০৫) বেশ পরিচিতি লাভ করলেও, পুরনো ঐতিহ্যকে তারা ধরে রাখতে পারেনি। এই দলের খেলাগুলির মধ্যে ছিল সাধারণ জীবজন্তু নিয়ে খেলা, মানুষের চোখ দিয়ে লোহার রড বাঁকানো, লোহার খাঁচা ও অন্ধকার কূপের মধ্যে মোটরসাইকেল চালানো প্রভৃতি। ১৯৭০-এ এই দলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'দ্য সাধনা লায়ন সার্কাস'।

সার্কাস আর কলকাতা এভাবেই একে অপরের সাথে গাট বেঁধেছিল একসময়। অবশ্য আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের এইসব স্মৃতি রোমন্থন করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কারণ, সময়ের পরিবর্তনে প্রতিটা বিনোদনেই আজ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার খুব বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে সহজ প্রাচীন বিনোদনগুলির জৌলুষ। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে মানুষের ধ্যান-ধারণা অনেকটাই পালটে গেছে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ আর সার্কাস খেলায় বন্যপ্রাণীর ব্যবহার কোনওভাবেই দেখতে পছন্দ করেন না। তাই এককালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনোদনেটি এখন মানুষের মুখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শক্তিশালী উপকরণ। এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে বাংলা ব্যান্ড ফসিলস্-এর সেই বহু বিখ্যাত গানের লাইন, 'থামি, শুনশান ফাঁকা বাইপাসে/ আর হৃদয়ের সার্কাসে/স্মৃতি দেয় দুয়ো আর হাসে ...।'

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

অভিযোগ:

সিইএসসি (উত্তর) ২২৩৭৩১৬১, ২২৩৭৬৪

সিইএসসি (দক্ষিণ) ২৪৬৬৪৬৪৩, ২৪৬৬৩১৬১, ২৪৬৬৩১৬২

বেহালা ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৭৮১৬৭৩

কালীঘাট ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৫৫৫৬০৯

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

হাতেগরম উল্টোডাঙা

কনিষ্ক ঘোষ

বর্ষা মানেই প্রেমের মরশুম। আর এই ভরা বর্ষায় ভালোবাসার ফ্লেভারকে একটু জমিয়ে দিতে শুধু লাল-নীল ছাতা নয় বৃষ্টিপাখির হাত ধরে বেরিয়ে পড়ুন শহর কলকাতায়। আর যদি এক পা-দু'পা করতে করতে উল্টোডাঙা পৌঁছে যান তাহলে বলব আপনার জিভে জল আনার হাজার একটা উপকরণ রয়েছে এখানে। সুতরাং চোখ-নাক-কান খোলা রেখে টেস্ট বা ওয়ানডে নয় সরাসরি টি-২০ শুরু করতেই পারেন।

খাবারের নাম শুনলেই যাদের জিভে জল আসে তাদের জন্য উল্টোডাঙা (বিধাননগর) স্টেশনের বাইরেই রয়েছে ফাস্ট ফুড সেন্টার 'জিভে জল'। রোল থেকে চাউমিন, এগ চিকেন মিক্সড বা হাক্কা, ঝাল কম বা বেশি, উইথ বা উইদাউট সস— যা চাইবেন একদম হাতে গরম অলটাইম রেডি। আপনি যদি স্ট্রিট ফুডের ভক্ত হন, সস্তায় এবং ভ্যারাইটিতে উল্টোডাঙা চত্বর আপনার অফিস ফেরত পেটপুজোর সেরা জায়গা হতেই পারে। এখানকার রেল স্টেশনের চিকেন মোমো যেমন হিট, তেমনি রয়েছে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বৌদির বিখ্যাত চায়ের দোকান। শুধু চা কেন চায়ের সাথে টায়েরও আছে দিব্বি আয়োজন। ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের টিকিট কাউন্টারের বাইরে রয়েছে ভজার চাউমিন, সন্ধের লম্বা লাইন আর টেম্পটিং গন্ধ আপনাকেও ক্লিন বোল্ড করে দিতে পারে। হাইজিন নিয়ে খুব একটা খুঁতখুঁতে না হলে একবার চেখে দেখতেই

পারেন। হতাশ হবেন না এটুকু গ্যারান্টি। তবে চেনা স্বাদ বদলাতে চাইলে আর একটু এগিয়ে যান ডানদিকের ফুটপাতে রয়েছে নামহীন মোমো স্টল। খাওয়ার পর মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরোবে 'ওয়াও'। তবে পনির রোল বা মিক্সড চিকেন রোল খেতে চাইলে 'উল্টোডাঙা রোল সেন্টার'-এ আপনকে সবান্ধবে স্বাগত। এখানকার ভ্যারাইটি রোল আপনাকে মোহিত করে দেবে। অনেকেই টেস্টি রোল খাওয়ার বাহানাতে প্রায়শই এখানে আসেন। এছাড়াও এখানকার ফিশফ্রাই এবং ফিশ কাটলেট লা জবাব। তবে ভেজ বা সাউথ ইন্ডিয়ান খেতে চাইলে বেস্ট অপশন 'সৌরভস'। এখানকার দইবড়া, উত্তাপম বা স্পেশাল ধোসার কোনও তুলনা হয় না। এক কথায় সিগনেচার। আর শেষে গরম গুলাবজামুন— জাস্ট ফাটাফাটি। এছাড়া সৌরভস-এ রয়েছে ঠান্ডা পানীয়েরও জবরদস্ত আয়োজন— লিচু থেকে ম্যাংগো, জলজিরা মিক্সড কোলা থেকে স্ট্রবেরি কী চাই! এর পাশেই রয়েছে মিও আমোরে। এখানকার চিকেন ইন্টারনেট আর চকোওয়েজ হতে পারে আপনার বেস্ট কম্বিনেশন। আর হ্যাঁ আর একটা কথা সুগার অ্যান্ড স্পাইসও কিন্তু এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। যেতে যেতে তাদেরও একটা আউটলেট চোখে পড়বে। জিভে জল আনা একাধিক মেনু নিয়ে তারাও হাজির। এখন সবটাই নির্ভর করছে আপনার চয়েসের ওপর। হাতে অপশন রয়েছে প্রচুর।

সাবেকিআনার সাথে আধুনিকতার মেলবন্ধন 'অন্নপূর্ণা হোটেল'-এর মূল ইউএসপি। আপনি যদি বাঙালি খাবারের ডাইহার্ট ফ্যান হন তাহলে এখানকার গোবিন্দভোগ চালের ভাত, সাথে রুইপোস্ত টেস্ট করে দেখতেই পারেন। তবে শেষ পাতে আমের চাটনি খেতে ভুলবেন না। আর চাইনিজ ভক্তদের বলব একবার 'হোটেল হংকং' থেকে খেয়ে আসুন। এখানকার চাইনিজ খাবারের স্বাদ একবার খেলে অনেকদিন মনে থাকবে।

এরপর চলে যান উলটোদিকের ফুটপাথে। নাকে আসবে ভরপুর বিরিয়ানির গন্ধ। নিজেকে রেজিস্ট করতে না পারলে বেফিকর হয়ে ঢুকে পড়াই যায় 'বিরিয়ানি সেন্টার'-এ। এখানকার স্পেশাল বিরিয়ানি সাথে চিকেন রেজালা— আপনার সন্ধেটা জাস্ট জমে যাবে। তবে এই চত্বরে আপনার ডেটকে একটু স্পাইসি এবং মেমোরেবেল করতে হলে সোজা ঢুকে পড়ুন 'রোজেনবার্গ রেস্টুরেন্ট'-এ। এখানকার কুল অ্যাম্বিয়েন্স আপনার মন ভালো করে দেবে। আর খাবার-দাবার নিয়ে কোনও কথা হবে না। সুস্বাদু স্টার্টার থেকে কবজি ডুবিয়ে মেইনকোর্স— এক কথায় অসম এক্সপেরিয়েন্স। আপনি এখানকার বিখ্যাত চিকেন স্পেশাল চিমনি স্যুপ দিয়ে শুরু করতে পারেন। চেখে দেখতে ভুলবেন না চিকেন ড্রামস্টিক। মেইনকোর্সে মিক্সড সিঙ্গাপুর ফ্রায়েড রাইস সাথে প্যান ফ্রায়েড চিলি ফিশ এবং সাংহাই চিকেন আপনার রসনার তৃপ্তি করবে। আর একটা কথা, এটুকু বলতে পারি উল্টোডাঙার ফুটপাথ থেকে একখান মিঠা পান না খেলে এই জার্নিটা শেষ হয়েও শেষ হবে না। তাহলে আর দেরি কেন। সময়-সুযোগ দেখে একদিন বেরিয়ে পরা যাক...

'কলকাতার ফুসফুস' ময়দান

নেহা প্রধান

মহানগরী তিলোত্তমার বুকে নস্টালজিয়ার সমার্থক খুঁজতে চাইলে তালিকার প্রথম দিকেই যেসব জায়গার কথা থাকবে তাদের মধ্যে কলকাতা ময়দান যে অন্যতম, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতার ল্যান্ডমার্ক হিসাবে পরিচিত বেশ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান যেমন— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা রেস কোর্স প্রভৃতি এই ময়দানেরই বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত। উত্তরে এসপ্ল্যানেডের রাজভবন থেকে দক্ষিণে আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং পশ্চিমে হুগলি নদীর পাড় ছুঁয়ে পূর্বে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঝে চারপাশে বড় বড় গাছগাছালিতে ঘেরা এই বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরকে যথার্থই 'কলকাতার ফুসফুস' নামে ডাকা হয়।

প্রায় আড়াইশো বছর আগে, পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুর গ্রামে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গোড়াপত্তন করে। গ্রামবাসীদের স্থানান্তরিত করা হয় সুতানুটি গ্রামের তালতলা, কুমারটুলি, শোভাবাজার অঞ্চলের বেশ কিছু জমি দিয়ে। হুগলি নদীর পাড়ে দুর্গের আশেপাশের একদা বাঘের হানা অধ্যুষিত বিশাল জঙ্গল কেটে সাফ করে গড়ে তোলা বিস্তীর্ণ, খোলা সবুজ দুর্গের মাঠ বা গড়ের মাঠই আজকের ময়দান।

আপনি চাইলে যে কোনও দিন, যে কোনও সময়ে চলে আসতে পারেন ময়দানে। ভোরের প্রাতঃভ্রমণই হোক কী বিকেলের বেলাশেষের আড্ডা, বর্ষায় ফুটবল থেকে শীতকালের জমাটি পিকনিক— কলকাতাবাসীর কাছে ময়দানের আকর্ষণ চিরন্তন। খোলা আকাশের নীচে বিশাল কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার ছায়ায় বসে গড়ের মাঠের হাওয়া খেতে খেতে একান্তে সময়যাপনের মাদকতাময় আকর্ষণই অন্যরকম। কোনওদিন ভোরবেলা এসপ্ল্যানেডে সিটিসির ট্রাম ডিপো থেকে প্রথম ট্রামে উঠে বসে পড়ুন, সকালের কুয়াশাভেজা ময়দানের বুক চিরে ট্রামলাইন চলে গেছে এঁকেবেঁকে। সবেমাত্র ঘুম ভেঙে ওঠা আপনার চিরচেনা কলকাতা ধরা দেবে অচেনা রূপে। কিংবা শরৎ বা হেমন্তে বিকেলের দিকে ঘুরতে ঘুরতে এসে পছন্দসই জায়গা বেছে বসে পড়ুন ময়দানের মাঠে। আকাশে মেঘের সঙ্গে রোদ্দুরের বাহারি রঙের খেলা দেখতে দেখতে কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে আসে টের পাবেন না। চাইলে সবান্ধবে এসে আড্ডা দিতে পারেন জমিয়ে, আবার ইচ্ছে হলে খেলাধুলোতেও মেতে উঠতে পারেন সবাই মিলে। নিছক অবসরযাপনের জায়গা হিসাবে গড়ের মাঠের জুড়ি মেলা ভার।

ময়দান বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মালিকানাধীন। ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গেই সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন হাইকম্যান্ডের সদর দপ্তর অবস্থিত। তাই ফোর্ট উইলিয়াম ও তদ্‌সংলগ্ন পরিসরে জনসাধারণের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। ১৮১৯ সালে ময়দানে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পূর্বদিকে চালু হয় শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রেসকোর্স।

ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম তিন প্রধান ক্লাব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং সহ আরও কয়েকটি ছোট-বড়-মাঝারি ক্লাবের তাঁবু এই ময়দানেই। শুধুমাত্র ক্রিকেট, ফুটবল, হকি কিংবা সেনাবাহিনীর প্যারেড গ্রাউন্ড নয়, ময়দান কলকাতাবাসীর কাছে আরও অনেক কিছু। একদিকে ঝালমুড়ি, আলুকাবলি, ফুচকা, লেবুজল, রোল-চাউমিন ইত্যাদির দোকান তো অন্যদিকে বেলুন-বাঁশি-খেলনাওয়ালাদের পসরা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে দেখা মেলে সারি সারি ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়ির। এদের কোনও একটিতে চড়ে আপনার প্রিয় মানুষটিকে পাশে বসিয়ে আপনি সেদিনের জন্য মনে মনে তার স্বপ্নের রাজপুত্র বা রাজকন্যা হয়ে উঠতেই পারেন।

ময়দান থেকে এগোলে পাশেই পেয়ে যাবেন নন্দন, রবীন্দ্রসদন, মোহরকুঞ্জ, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল। উত্তরে ইডেনের পাশ দিয়ে আকাশবাণী ভবন, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামকে ধারে রেখে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বাবুঘাট পর্যন্ত। এতদূর পড়ে নিশ্চয়ই আপনিও ময়দানে ঘোরাঘুরির স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাহলে আর ঘরে বসে ভাবছেন কি? ছুটির দিনই হোক কী কাজের দিনের অবসরের সময়টুকু, একবার গিয়ে ঘুরেই আসুন গড়ের মাঠে। আবারও হয়তো নতুন কিছু স্মৃতি নিয়ে ফিরতে পারেন, কে বলতে পারে!

মাঝেমধ্যেই শোনা যায় আর্তচিৎকার

সোমনাথ আদক ও তন্ময় মণ্ডল

শহর মানেই শুধু মানুষের কোলাহল, বড় বড় বিল্ডিং, ঝাঁ চকচকে রাস্তা নয় আরও এমন অনেক কিছুই আছে যা আপনার পা থেকে মাথা অবধি শিহরণের ঝড় তুলে দেবে। মানুষের কোলাহল থেকে অনেক দূরে গ্রাম-গঞ্জেই তেনারা থাকবেন, এ ধারণায় ছেদ ফেলে দেওয়ার মতো অনেক গল্পই প্রচলিত আছে শহর কলকাতায়। যদিও গল্প না সত্যি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা, তবু অনুমানের কাঁধে ভর করেই বছরের পর বছর প্রচারিত হতে থাকে হাড় হিম করা ঘটনায় মোড়া সব প্যারানর্মাল আকটিভিটি। আর এমনি সব রহস্যময় কাহিনি লেগে আছে তিনশো বছরের পুরনো শহরের অলিতে-গলিতে। শোনা যায় কলকাতার বুকে এমন অনেক পুরনো বাড়ি আছে যেখানে রাত নামলে সত্যি নেমে আসে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী একাধিক বড় বড় বাড়িতে এখনও যারা রাতে পাহারা দেয় তারা এইসব জায়গার নাম শুনলে নাকি রীতিমতো ওপরওয়ালার নাম জপতে শুরু করে। এমনই একটা জায়গা হল খোদ কলকাতার পুলিশ কার্যালয়ের সদর দপ্তর, লালবাজার।

মধ্য কলকাতার বিবাদি বাগ-সংলগ্ন অঞ্চলেই অবস্থিত লালবাজার। এই অঞ্চলটি শহরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান পুলিশ কার্যালয়টি ছিল আদতে কলকাতার এক বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, জন পামারের বাসভবন। কথিত আছে, তারও আগে এটা ছিল একটা পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কোনও এক কৃষ্ণাঙ্গ স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ি। আদি কলকাতার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্তি হিসাবে ফাঁসিতে ঝোলানো হতো। আর লালবাজার ও চিৎপুর রোডের (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী) সংযোগস্থলে সে যুগে একটি ফাঁসির মঞ্চও ছিল। বর্তমান লালবাজার পুলিশ সদর কার্যালয়টি নির্মাণ করা হয় ১৯১৯ সালে।

আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমজনতার রক্ষাকর্তারা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করেন খাস কলকাতার প্রায় ১০০ বছরের পুরনো এই বাড়ি অর্থাৎ লালবাজার পুলিশ কার্যালয়টির সেন্ট্রাল লকআপে ভুত আছে। আর ভুত যে আছে তার প্রমাণও নাকি মিলেছে। সালটা ১৯৭৫, কলকাতা জুড়ে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। সে সময় একজন সমাজবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে বন্দি ছিলেন। ওই সময় তিনি দেখেছিলেন, একটু রাত হলে সেন্ট্রাল লকআপের আশপাশে কোনও পুলিশ আসতে চাইতেন না। তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন এই বিষয়টি দেখে। পরে তাঁর সহবন্দিদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে, তারা জানান, লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপের কাছে নাকি চারু মজুমদারের ভুত আছে।

১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই লালবাজার সেন্ট্রাল জেলের লকআপে রহস্যজনকভাবে মারা যান চারু মজুমদার। অনেকেরই অভিমত তাঁর মৃত্যু নাকি স্বাভাবিকভাবে হয়নি। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর থেকেই নাকি সেন্ট্রাল লকআপের আশপাশে চারুবাবুর অশরীরী আত্মাকে বহুবার ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে বলে লালবাজার পুলিশ কার্যালয়ের সদস্যদের অভিমত। রাত নামলেই বদলে যায় খুব চেনা ঐতিহ্যবাহী বাড়িটা। এখনও রাত গভীর হলে ডিউটিতে থাকা কোনও পুলিশ সদস্যই ওদিকে যেতে চান না। শোনা যায় গভীর রাত হলেই নাকি চারুবাবুর অশরীরী আত্মা ফিরে আসে। সেন্ট্রাল লকআপের আশপাশে ঘুরে বেড়ায় তাঁর ছায়ামূর্তি। একবার দেখা দিয়েই নিমেষে মিলিয়ে যায় সেই ছায়া। সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যেই শোনা যায় আর্তচিৎকার। সে যেন এক জেহাদির অতৃপ্ত সম্ভাষণ। অদ্ভুত এক গা-ছমছমে আবহাওয়া। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই সেই স্মৃতিরোমন্থনেও নাকি ভয় পান। যাঁরাই লালবাজার সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জানে এই ব্যাপারটা প্রত্যেকেই প্রায় কমবেশি শুনেছে।

চির ব্যস্ত কলকাতার এই পুলিশ কার্যালয়ের সদর দপ্তরটিকে ঘিরে যেমন আছে প্রশাসনিক ব্যস্ততা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন তেমনি এর গায়ে লেগে আছে এমনি গা ছমছমে হাড় হিম করা রহস্যকথা। ভূতকে যারা তীব্র কটাক্ষে মানসিক ভ্রম বলেন, তেমন লোকের অবচেতনেও কিন্তু গভীর রাতের লালবাজার মানেই কোথাও না কোথাও চারু মজুমদারের ভূত!

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

পার্ক হোটেল (২২৪৯৩১২১)
পিয়ারলেস ইন (২২২৮০৩০১)
অ্যাস্টর হোটেল (২২৮২৯৯৫০)
ফেয়ারলন হোটেল (২২৪৫১৫১০)
হোটেল রাত দিন (২২৪৭৬৯১১)
লিটন হোটেল (২২৪৯১৮৮১)
হোটেল শালিমার (২২২৮৫০৩০)
হোটেল আনন্দ ভবন (২২৩৭৪০১৪)

আমার চোখে কলকাতা

প্রথম পাতার পর

তবে আস্তে আস্তে '৬৬-'৬৭ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সেসময় কিছুদিন কলকাতা অশান্ত ছিল। তবে অন্তত শান্তিতে বসবাসটুকু করা যেত। এখন যেমন গভীর রাতে যদি কখনও বাড়ি ফিরি কেমন যেন একটা আতঙ্ক কাজ করে। এই ব্যাপারটা ছিল না। এই শহর দিনে দিনে রাজনৈতিকভাবে খুব জটিল হয়ে উঠছে। শান্তিপূর্ণভাবে থাকার আবহাওয়াটা কেন জানি না মনে হয় দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন কলেজে পড়ছি ষাটের দশকে তখন নাইট শো-এ সিনেমা দেখে অনায়াসে বাড়ি ফিরতাম। আক্রান্ত হবার ভয় ছিল না। তবে এখন কিন্তু যথেষ্ট ভাবতে হয়, সতর্ক থাকতে হয়। মেয়েরা যদি কেউ বাইরে যায় আমরা অপেক্ষা করি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি ফিরব। একটা ভয় সবসময় কাজ করে। আর মানুষ দিনকে দিন যা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে বলার মত না।

এই শহরটা আমাদের সকলের শহর তাই শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখাটা খুব দরকার। এর যতটা দায়িত্ব সরকারের ততটাই আমাদেরও। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্লাস্টিক বা চিপসের প্যাকেটটা যেখানে সেখানে ফেলবার আগে একবার নিজেদেরই ভাবা উচিত। নিজের শহরে যত খারাপ ঘটনা ঘটুক না কেন, অন্য শহরে গেলে বা বেশিদিন থাকলে বুঝি এই শহর ছেড়ে থাকা মানে একটা শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা। এ-শহরের প্রতি এমনই টান যে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও থাকাটা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৩১ জুলাই ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

রাতে যেন আরও মোহময় হয়ে ওঠে কলকাতা

তাহমীদ বরকতউল্লাহ (চিত্রশিল্পী)

কলকাতা আমার ভালোলাগার শহর, ভালোবাসার শহর। নিভৃতে এ-শহরের পরশ অনুভব করা যায়। এত টান তার কারণ আমাদের ভাষা আর আমাদের সংস্কৃতি। আমার দেশের শহর ঢাকা যেমন আমার হৃদয়ের খুব কাছের কলকাতাও তাই। আসলে কলকাতায় গেলেও মানুষের মুখে সেই বাংলা ভাষাই শুনতে পাই। কলকাতাকে তাই অন্য দেশ বলে ভাবতে পারি না। সীমান্ত তো রাজনীতির কারবারিরা দেয়। হৃদয়ে তো আর কাঁটাতার থাকে না।

কলকাতা আমার খুবই আবেগের জায়গা। কলকাতা লাগোয়া হুগলি জেলা ছিল আমার পূর্বপুরুষের ভিটে। জন্মের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই বাসায় কলকাতার গল্প শুনতাম। শহরটাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেকদিনের। অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল ২০০৫ সালে। আমি, আব্বু আর আমার দুই ভাই ঠিক করলাম আমাদের ভিটেবাড়ি দেখতে যাব। গেলামও। সেই প্রথমবার কলকাতায় পা রেখেই বুঝেছিলাম এ-দেশ আমার দেশের চেয়ে আলাদা কিছু নয়।

হুগলির কোন্নগরে যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষের বাসা ছিল সেখানে গেলাম। সেই জমি ছেড়ে আমার আব্বুরা যখন বাংলাদেশে চলে যায় তখন আব্বুর বয়স দশ। সুভাষ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক এখন সেখানে থাকেন। সুভাষবাবুর সাথে অনেকক্ষণ কথা হল। তাঁর আন্তরিকতার কথা মনে থাকবে অনেকদিন। এরপর ঠিক হল আমরা পার্কসার্কাসে নানার বাড়িতে উঠব। রওনাও হলাম। সেইদিনের কথা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। ফিরে আসার সময় আব্বুর চোখদুটো দেখলাম ছলছল করছে। একটা জিনিস বুঝেছিলাম, দেশ তো মানুষের অন্তরে থাকে কে কবে দাগ টেনে দিল তাতে কিই বা আসে যায়। এই ছিল আমার প্রথম কলকাতাকে দেখা। যদিও তা খুবই অল্প সময়ের জন্য।

এরপর দ্বিতীয়বার কলকাতায় গেলাম ২০০৯ সালে একটি আর্ট এগজিবিশনে যোগ দিতে। আমার জীবনের সেটা ছিল সেকেন্ড এগজিবিশন। তাই কলকাতা আমার শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি আবেগের। সেবার গিয়ে উঠেছিলাম শিয়ালদহের ক্যালকাটা লজ বলে একটা লজে। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃতির কথা অনেকের কাছে শুনেছি। বইয়েও পড়েছি। এবার ইচ্ছে ছিল উত্তর দক্ষিণ— দুদিকেই একটু ঘুরে নেব। শিয়ালদহ থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে কলেজ স্ট্রিট। বই আর বই। আমার মত বইপ্রেমীদের কাছে এ জায়গার মূল্য অনেক। কফি হাউসে গেলাম, বসলাম। এর ঐতিহ্যের কথা কে না জানে! অন্যরকম একটা অনুভব হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বইয়ের পৃষ্ঠা ধরে আসতে আসতে চোখের সামনে সব ঘটনা সত্যি হয়ে গেছে। আমি যেন কিসের একটা ঘোরে পড়ে গিয়েছিলাম।

সেদিন কফি হাউস থেকে চলে গেলাম রবীন্দ্রসদন। এগজিবিশনের শেষ দিন ছিল সেটা। দুদিনের এগজিবিশন শেষ হল কলকাতা অ্যাকাডেমিতে। ট্যাক্সিতে রবীন্দ্রসদন থেকে সোজা শিয়ালদহ। মনে হচ্ছিল রাত নামলেই যেন আরও মোহময় হয়ে ওঠে কলকাতা। সারাদিনের ব্যস্ততা কোথায় যেন উবে যায়। আমি পরের দিনটা ঠিক করে রেখেছিলাম কলকাতা ঘুরে দেখার জন্য। দেখলাম জাদুঘর, বিড়লা তারামণ্ডল, সেখান থেকে চলে গেলাম চিড়িয়াখানা। তারপর প্রিন্সেপ ঘাট। আসলে এই জায়গাগুলোর বর্ণনা দিতে গেলেই তা এক একটা বিরাট প্রবন্ধ হয়ে যাবে। এক কথায় বলতে গেলে পুরনো আর নতুনের মেলবন্ধনে এ এক অদ্ভুত শহর। কলকাতায় কাটানো দিনগুলো আমার কাছে খুবই ভালোলাগার। কলকাতা আমার খুব প্রিয় একটা শহর। সুযোগ পেলেই চলে যাব প্রিয় কলকাতার সান্নিধ্য পেতে।

বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ

শ্রেয়ান সেন

কিছু মানুষ তাঁর কাজের মাধ্যমে নিজের জাতি তথা দেশকে বিশ্বে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন। সময় বয়ে যায়, সময়ের স্রোতে তাঁদের জীবদ্দশার সমাপ্তি হলেও তাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে। বিশ্বের দরবারে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এমন মানুষজনেরই একজন হলেন বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ। তিনি বাঙালির দেহচর্চার ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলেন।

অবিভক্ত বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ধামতি নামের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ১৯১৩ সালের ১৭ ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দেশভাগ আর সাম্প্রদায়িক হানাহানির শিকার হয়ে তাঁর পরিবারকে স্বদেশভূমি ছেড়ে চলে আসতে হয় কলকাতার দমদমের নাগেরবাজারে। এরপর তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে যান। কিন্তু তাঁর কথায়, সেই কুমিল্লার ভাষাকে কোনওদিন বর্জন করেননি তিনি। শরীর তাঁর কাছে ঈশ্বর। বডি বিল্ডিং নিয়ে অমনভাবে তাঁর সময়ে কেন এখনও ভাবে খুব কম বাঙালিই। যেমন ঋজু সুঠাম চেহারা, তেমনই তাঁর তেজ। কী কথায়, কী তাঁর ভাবভঙ্গিতে। বাড়িজুড়ে বিশাল জিমনাসিয়ামে তাঁর নতুন প্রজন্মের বডিবিল্ডার্স তৈরি করার কারখানা। শেষ বয়স অবধিও তাঁর উদ্যম ছিল অবাক করা। সেই মানুষটির সাফল্যের গ্রাফ রীতিমতো আকর্ষণীয়। তিনি ১৯৫২ সালে মিস্টার ইউনিভার্স জিতেছেন। তিনি তিনবার এশিয়ান গেমস বডিবিল্ডার্স জিতে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। আর মানুষটির উচ্চতা হচ্ছে শুধুমাত্র ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি, মানে ১.৫০ মিটার। তিনি 'পকেট হারকিউলিস' নামেও পরিচিত।

বাংলাদেশে থাকাকালীনই শৈশব থেকেই, শক্তিসম্পর্কিত গেমস; যেমন— কুস্তি ও অন্যান্য জনপ্রিয় গেমসের মধ্যে ভারোত্তোলন ইত্যাদিতে মেতে ওঠেন। বিশ্বের তাবৎ খেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহী ছিলেন ফুটবল খেলা নিয়ে। মাত্র ১২ বছর বয়সে কালাজ্বর-এর অতর্কিত আক্রমণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। তবে তিনি নাকি শারীরিক ফিটনেস ব্যায়াম দিয়ে সেই শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি যেমন শরীরচর্চার ব্যায়াম শুরু করেছিলেন ছোট বয়সে, তেমনি তিনি তা ধরে রেখেছিলেন শেষ বয়সেও। চিরদিন তিনি করে গেছেন ক্লাব সংগঠন। আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা। একসময় যা এই বাংলায় ছিল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলাধুলা। বিনামূল্যে তিনি শিখিয়েছেন অনেক যুবককে।

১৯৪৩ সালে তিনি ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। সেখানেও তিনি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে ১৯৫০ সালে, মনোহর আইচ জিতেছিলেন মিস্টার হারকিউলিস প্রতিযোগিতা। ১৯৫১ সালে তিনি মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি মিস্টার ইউনিভার্স খেতাব জেতেন। ১৯৫৫ সালে তিনি মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার দাঁড়িয়ে তৃতীয় এবং ১৯৬০ সালে তিনি ৪৭ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। সত্যি বলতে তিনি বিশ্বে শরীরচর্চার জন্য জনপ্রিয়। তাঁর শক্তিমত্তা এবং খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য পেশি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বহুলভাবে প্রশংসিত। আর তাঁর খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে না বললে অনেক কিছুই বলা হবে না। তিনি শেষ বয়সেও নিয়মিত মাড়সহ ভাত, ডাল, শাকসবজি, নানারকম ফল, প্রধানত আম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতেন। আর তাজা মাছ খুবই পছন্দের ছিল তাঁর।

এমন অনেক জিনিসই তিনি করতে পারতেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর। দাঁত দিয়ে ইস্পাত বাঁকানো, তরোয়ালের ওপর উদর অধিস্থাপিত করা, দেড় হাজার পাতার বই নিমিষে ছিড়ে ফেলার মতন ক্রীড়াকৌশলাদি প্রদর্শন করতে পারতেন। দেশপ্রেমিক হওয়ার কারণে ব্রিটিশদের হাতে কারাবরণও করতে হয়েছিল মনোহর আইচকে। ২০০৩ সালে ৯০ বছর বয়সে শেষ প্রদর্শনী করেন তিনি। ২০১৬ সালের ৫ জুন ১০৪ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।